বিকেলে টিপরা বাজারের পাশ দিয়ে বাজারে ঢুকলাম। আমি একা একটা রিকসায়। রাখি আর কেয়া আমার পিছনে অন্য একটায়। কর্তব্যরত মিলিটারি পুলিশের কাছে জানতে চাইলাম একাত্তরের শহীদ স্মৃতি কোনখানে সংরক্ষিত। হাত তুলে ঈঙ্গিত করলো সহৃদয় অল্পবয়সী মিলিটারি পুলিশ। বললো—ঐতো দাঁড়িয়ে আছে 'যাদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ'।

তার হাত অনুসরণ করে তাকাতেই দেখি অদূরেই সবুজ ঘাসে ঢাকা ঝকঝকে চত্বরে সুন্দর সিরামিক ইটের তৈরি মনোরম স্মৃতিসৌধ। আমি রাখির হাত ধরে এগুতে চাইলে ও থমথমে গলায় বললো— এবার তোর নয়, আমি কেয়ার হাত ধরবো। কেয়া ওর মেয়ে যাকে একুশ দিনের রেখে দুলাভাই কুমিল্লায় এসেছিলেন।

আমি রাখির পিছনে, ও এগিয়ে গেলো। বাম হাতে শক্ত করে কেয়াকে ধরে রেখেছে! স্মৃতি ফলকে লেখা প্রথম লাইনটা ও পড়লো, ওহে পথিক বলো ওদের গিয়ে, মাতৃভূমির সম্মানে ..... আর পড়তে পারলো না। দেখলাম থরথর করে কাঁপছে রাখি। কেয়া ওকে সামলানোর চেষ্টা করছে। চোখ মুছে ও বাকি অংশটুকু পড়া শেষ করলো—শহীদ আমরা। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো রাখি। বললো—তুমি এখানে একা কতকাল ধরে শুয়ে আছ! জানি তোমার বড্ড কষ্ট কিন্তু আমি কি করতে পারি! এই তোমার ছোট মেয়ে কেয়া, তোমাকে দেখাব বলে ওকে নিয়ে এসেছি। দেখ তুমি, দেখ কত বড় হয়েছে ও। আমি ওদের আগলে আগলে রেখেছি, কিন্তু আর পারি না।

রাখির বিলাপ শহীদ মিনার এলাকার বাতাসকে ভারি করে তুললো। বললো—আমি এবার অবসর চাই, তোমার কাছে আমাকে একটু ঠাঁই দেবে! বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো রাখি।

কেয়া বসে আদর করে ওর মাথাটা কোলে তুলে নিলো। তারপর সৌধের দিকে তাকিয়ে বললো—বাবা, তোমাকে কোনদিন দেখিনি! তবে তোমার ছবি আঁকা আছে আমার বুকে। আমি জানি তুমি দেখতে কেমন। দেখা হলে নিশ্চয়ই খুব আদর করতে! আমাদের ছাড়া তোমার খুব কষ্ট তাই না বাবা! মা'র সাথে ঝরঝরে করে কাঁদতে শুরু করলো কেয়া।

সূর্য পাটে বসেছে। রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ধীরে ধীরে লাল আভা আরো লাল হলো। মনে হলো দুলাভাইয়ের বুকের ফিনকি দেয়া রক্ত চারদিকে পড়েছে পৃথিবীটাকে রঙের খেলায় ভরিয়ে দিতে। দূরে ঘুঘু ডাকছে থেমে। আরো দূরে একটা কোকিল ডাকলো কু-উ। শহীদ স্মৃতি'র চত্বরে কিছু ফুল ফুটেছে। হালকা বাতাসে নড়ছে মৃদুমৃদু। আমার মনে হলো ফুলের চোখ দিয়ে দুলাভাই তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখেও কি এখন অমন বাঁধভাঙ্গা কান্না।

আমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কম্পিত বাতাসে তৃতীয় কার কান্নার শব্দ পেলাম।

[আমাকে রচনা লিখতে বলা হলো। লিখতে বসলাম এবং লিখতে লিখতে আমার নিতান্ত প্রিয় গণ্ডির কিছু বেদনামূর্ত মুহূর্ত কখন যে কলমের আঁচড়ে মূর্ত হয়ে উঠলো বুঝতে পারি নি। যাদের নিয়ে এ গল্প তাদের হৃদয়ও কী সত্যি সত্যি আমার মতো বেদনায় আর্ত হয়ে উঠবে!]

এই দিন সেই দিন

হ্যালো।

খসরু ভাই?

কী হয়েছে মাসুদ?

অস্থির গলায় মাসুদ তার বড় ভগ্নিপতিকে বললো—আব্বা যেন কেমন করছে আপনি একটু তাড়াতাড়ি আসেন।

রাত এগারোটার টেলিফোনের শব্দে ছুটে এলো শর্মি। স্বামীকে বললো—কার টেলিফোন? কার সাথে কথা বলছো?

মুখে আঙুল তুলে চুপ করার জন্য ইঙ্গিত করলো খসরু।

কখন থেকে এ অবস্থা, বলো তো? জিজ্ঞেস করলো মাসুদকে

ওপারের উত্তর শোনার আগেই শর্মি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। হাউমাউ করে কান্না শুরু করলো সে। বললো—আব্বা নেই, নিশ্চয়ই তুমি মাসুদের সাথে কথা বলছো।

খসরু টেলিফোনের স্পিকার ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে নরম চোখে তাকালো স্ত্রীর দিকে।

বললো—এখনও কিছু হয়নি, মাসুদের সাথে কথা শেষ করতে দাও। আবার টেলিফোনে কথা শুরু করলো খসরু। কী বললে? খালা আম্মা ইনজেকশন দিয়েছে, একবারে দু'টো। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্লাড প্রেসার এখন কত?

ওপার হতে ভীত কণ্ঠ ভেসে এলো মাসুদের। খালা আম্মা অনেকক্ষণ ধরে মাপার চেষ্টা করছেন, আমাদের কিছু বলছেন না।

বুক কী উঠানামা করছে? না হয় নাকের কাছে তুলা ধর, দেখ তুলা নড়ে কিনা। কণ্ঠ সংযত করে প্রশ্ন করলো খসরু।

মাসুদের ভীত কণ্ঠ শোনা গেল ফোনে। বললো—খসরু ভাই, কোন নড়াচড়া বোঝা যায় না।

শর্মি আবার হাউমাউ করে কান্না শুরু করেছে। ছেলে মেয়ে দু'টো মা'র দু'পাশে এসে দাঁড়ালো।

খসরু টেলিফোন রেখে স্ত্রী'র দিকে ফিরে বললো—মনে হয় আমাদের যাওয়া উচিত। ওরা কেউ অবস্থা বুঝতে পারছে না। মেয়ে কান্তাকে বললো—তোর মা'র কাপড়গুলো দে, কি জানি রাতে যদি থাকতে হয়। আর তোরাও সাথে কিছু নিয়ে নে।

ওরা সবাই হুড়োহুড়ি করে কাপড় সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস গোছাচ্ছে। খসরু টেলিফোন তুলে অফিসে ডায়াল করলো। তার পরিচিত ড্রাইভার নজরুলকে

বললো—তুমি গাড়িটা নিয়ে এখনি চলে আস, আমাকে উত্তরায় যেতে হবে। মনে হয় অপেক্ষা করছে কোন দুঃসংবাদ।

জে আচ্ছা, আমি আইতাছি স্যার, আপনে চিন্তা করবাইন না। বলে নজরুল টেলিফোন রাখলো।

খসরু ভাল করেই জানে নজরুলের বাসায় পৌঁছতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। বড্ড অনুগত ড্রাইভার। জরুরি অবস্থা বোঝে ঠিক ঠিকই।

এবার খসরু টেলিফোন ডায়াল ঘোরাল তার বড় সাহেবের বাসায়। বললো—স্যার, রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। মনে হয় শ্বশুর ইন্তেকাল করেছেন। আমি এখন ওখানে যাচ্ছি, কালকে একটা দিন ছুটি লাগবে।

বড় সাহেবের গলায় বিরক্তি মাখানো সহানুভূতি। বললো—দরখাস্তটা অফিসে ভোরে পাঠিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।

ঠিক আছে স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ।

টেলিফোন নামিয়ে রাখলো খসরু। দ্রুত কাপড় পরলো। বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ড্রাইভার কলিংবেল চাপার আগেই পুরো পরিবারটা হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে এলো। তাড়াহুড়োয় দরজায় চাবি লাগাতে ভুলে গেল ওরা। সবাই উঠে বসেছে গাড়িতে।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল—ঘরে তালা দিয়েছ?

— না তো!

ভড়কে গেলো খসরু। দ্রুত নেমে গেল গাড়ি থেকে। পকেট হাতড়ে চাবি বের করলো। দরজা বন্ধ করে আবার গিয়ে গাড়িতে বসলো। ড্রাইভারকে বললো—নজরুল, ব্যস্ততায় মানুষের বেশি ভুল হয়, তুমি ধীরে সুস্থে চালাও।

নজরুল মুখে স্বভাবসুলভ সরল হাসি ফুটিয়ে বললো—কিছু ভাববাইন না স্যার, আমি ঠিক আছি।

২

দেখতে দেখতে মিরপুর থেকে ঢাকা সেনানিবাস পার হয়ে গাড়ি ঢাকা টংগি মহাসড়কে পৌঁছে গেলো। সোডিয়াম লাইটের উজ্জ্বল আলোয় চারদিক আলোকিত। উল্টো দিক থেকে এর সারি গাড়ি সাঁ করে চলে যাচ্ছে সাঁই সাঁই। ওদেরকে ওভারটেক করে রঙ সাইড থেকে দ্রুত চলে গেলো দু'টো গাড়ি। ড্রাইভার বললো—দেখলেন স্যার, ক্যামবায় হুশ কইরা রঙ সাইড দিয়া পার অইলাইন।

খসরু কোন কথা বললো না। শর্মির হাউমাউ কান্না শোনা যাচ্ছে না বটে তবে গাড়ির শব্দ ছাপিয়ে কিছুক্ষণ পর পরই দীর্ঘশ্বাস, আর ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে নাক মোছার শব্দও ভেসে আসছে।

নজরুল বললো—বেগম সাব, কানবাইন না, খোদায় দেখবে। মানুষের কিছু করণের নাই। ওর কথা শুনে শর্মির কান্নার মাত্রা আবারও বাড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি জিয়া বিমানবন্দর ক্রস করে উত্তরায় জসীম উদ্দীন রোড ধরে এগুলো। আরো এগিয়ে ডান বাম করে ভাঙা রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে যখন সবাই বাসায় এসে পৌঁছল তখন রাত সাড়ে বারোটা।

খসরু সবাইকে পিছনে ফেলে সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উপরে উঠলো। তৃতীয় তলায় পৌঁছেই দেখলো সবাই একদম চুপচাপ, হাঁটাহাঁটি করছে কেউ কেউ। মাসুদের সাথে দেখা হলো সিঁড়ির গোড়াতেই।

খসরু জিজ্ঞেস করলো—আব্বা কোথায়?

আগের ঘরেই আছে, আসেন। বলে মাসুদ সামনে সামনে এগিয়ে গেলো।

শুয়ে আছেন বৃদ্ধ শ্বশুর। বৃদ্ধা শাশুড়ি একপাশে বসা, বড় ছেলে আর তার স্ত্রী বসে বসে কোরআন শরীফ পড়ছে ।

মাসুদ বললো—শরীর গরম, আপনে একটু দেখেন।

দেখলো খসরু। এক নজর দেখেই বুঝে ফেললো কি হয়েছে। বিগত দশ বছরের চিকিৎসার অভিজ্ঞ চোখ এড়িয়ে গেলো না এই অন্তিম শয়ন। কিন্তু সবার আশ্বান্বিত চোখের সামনে সরাসরি কিছু বললো না। এগিয়ে গিয়ে যত্ন করে শ্বশুরের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলো। দেখলো পালস। না, নেই, অনুভবের উর্ধ্বে। স্টেথোসকোপ রাখলো বুকের ওপর, অনেকক্ষণ, এক মিনিট, দু'মিনিট। না, প্রাণপাখি নড়ছে না।

চোখ তুলে পহেলা চোখাচোখি হলো খালা শাশুড়ির সাথে। সবার উপর থেকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এলো ও। শর্মি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে, চোখে একধরনের আকুতি। মাসুদ অস্থির ভাবে নিজের মাথায় হাত বুলাচ্ছে। শাশুড়ি তাকিয়ে আছেন, একদৃষ্টে, এমনভাবে যেন ওর এক কথায় জেগে উঠবেন অন্তিম শয়নের মানুষটি। বসে বলবেন, হেলেন ভাত দাও, খাব। হয়তো ডাক দিয়ে মাসুদকে বলবেন—ছোট জামাইকে সৌদি আরবে টেলিফোন কর, আগামি বকরা ঈদ সে আমাদের সাথে ঈদ করবে। নয়তো বলবেন, ফাতেমার বাবাকে ডাক, আরমানিটোলার ভাড়া পাই না তিন মাস। কেন ওরা ভাড়া দিচ্ছে না, একটু দেখে আসুক।

ধীরে ধীরে খসরু ঘাড় সোজা করলো। ওর শ্বশুড়ের বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, মুখটা সামান্য হা হয়ে আছে, চোখ অর্ধ নিমিলিত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ধবধবে ফর্সা মুখের দিকে। কিছু স্মৃতি, টুকরো টুকরো কথা ভেসে উঠলো নিমিষেই। এই চোখ দু'টো ওকে স্নেহময় দৃষ্টিতে দেখেছে বহুদিন। উপদেশ দিয়েছেন দু'হাত মাথায় রেখে, আশীর্বাদ করেছেন..... ।

আস্তে আস্তে চোখের ওপর দু'হাত দিয়ে চোখ দু'টো বন্ধ করে শাশুড়ির দিকে বললো—আম্মা, চাদরটা পুরো টেনে মাথাটা সহ ঢেকে দিই?

এর অর্থ কারো অজানা নয়। শাশুড়ি আলতো করে ঘাড় কাত করলেন। তার চোখ শুকনো, মুখখানি ব্যথায় ভরা। হয়তো কাঁদতে ভুলে গেছেন। কিন্তু চারদিকে থেকে হু হু করে কান্নার একটা আওয়াজ ঘরটা ভারি করে তুললো।